International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 28-34
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.6.issue.05W.065

বিশ শতকের কলমে উনিশ শতকের প্রান্তিক সমাজ, ভাঙাগড়া ও সংলগ্ন জীবনচেতনা: প্রসঙ্গ সমরেশ বসুর 'উত্তরঙ্গ'

শ্রেয়সী আইচ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

'Uttaranga'(1951) is the first published novel by Samaresh Basu. Though it was written in the twentieth century, yet its background lies in the nineteenth century. Hiralal, an absconded, ill-fated non-Bengali warrior of Sepoy Mutiny (1857), is the main character of this novel. The fled-away soldier ultimately arrived at Aatpur, near the Jagaddal-Senpara area of Bengal. He got back his new life within the socially and economically marginalised people of that rural society. The livelihoods of these marginalised people, their problems, their believes, their humanities, their views of life are depicted here. The colonial industrialisation like establishment of jute-mills, along with introduction of new rules and regulations, imposition of additional taxes convert their lives into a distressful state. In search of livelihood, the cultivators and many vocational people were compelled to become day-labourers of the factories. Due to these ups and downs of their lives and livelihoods, some of them were mentally shocked and committed suicide. The conscience of the patriotic sepoy, Hiralal (Lakhai), hates colonial industrialisation. With the rapid progress of science and technology, industrialisation becomes inevitable. At the end of the novel, a picture of placement of a nail (thinking it as a cylinder) on the country-soil by a future generation native reveals a new sense of nationalisation.

Key words: Deprived marginalised class – their society, believes, sense of humanities – changes due to industrialisation – views towards life – future generation.

"সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনি নয়।"[১]

'ইছামতী' উপন্যাসের প্রারম্ভে এ কথা বলেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজা-রাজড়া, শক্তিমান-কীর্তিমানের বাইরে দেশের অগণিত জনগণ, যাদের এককের কথা থাকে না কোনও স্মরণীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠায়, তাদের জীবন, জীবনের ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত কখনো কখনো সাহিত্যের আধার হয়ে ওঠে। সালতারিখ তথ্যপ্রমাণ-সংবলিত বস্তুনিষ্ঠ না হওয়ায় ইতিহাস তাদের স্থান দিতে অপারগ হলেও পাথুরে প্রমাণের অভাবে সাহিত্যের পাতায় অপাংক্তেয় হয়ে থাকে না। বিশ শতকে স্বাধীনতার পরপরই সমরেশ বসু রচনা করেন 'উত্তরঙ্গ'। উত্তরঙ্গ সমরেশ বসুর প্রথম রচনা নয়, তাঁর প্রথম রচনা 'নয়নপুরের মাটি'। তবে 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। 'উত্তরঙ্গ' যে সময়টার কথা জানান দেয় তা বিশ শতক নয়, সমরেশের চোখে দেখা সময় নয়, এর প্রেক্ষাপট উনিশ শতকীয় অতীতের

গর্ভে। নিজের জীবনের চোখে দেখা, ফেলে আসা অভিজ্ঞতা ঔপন্যাসিককে এ উপন্যাস রচনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক হয়েছে উপযুক্ত কল্পনাশক্তি, সমাজবাস্তবতার প্রখর বোধ এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভিজ্ঞতা। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে দেখা যায় কালো দুলেকে, জীবনের স্বর্ণালী অতীতের স্মৃতিচারণ করেন যে বৃদ্ধ নবীন প্রজন্মের কাছে। আগ্রহী তরুণদের কাছে তা কিংবদন্তীর মতো, রূপকথার মতো। 'উত্তরঙ্গ' -এর রচনাকারের কালো দুলে নবকুমার ঘোষ। সমরেশ বসুর রচনাসংগ্রহের সম্পাদক ড. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের সূচনাংশে জানান, "আমার আজও মনে আছে সমরেশের এ জাতীয় উপন্যাস রচনার পদ্ধতি প্রক্রিয়ার কথা, তাঁর অনলস শ্রমস্বীকারের কথা। পট আর অনুপুঙ্খায়নে তাঁর বিন্দুমাত্র শৈথিল্যকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। নবতিপর বৃদ্ধ নবকুমার ঘোষের স্মৃতি লোক এবং সংগ্রহসম্ভব সমস্ত সূত্র তিনি ব্যবহার করেছেন।"[২]

যে জগদ্দল-সেনপাড়া অঞ্চলের বিস্মৃতপ্রায়, মৃতকল্প অতীতকে উপন্যাসের কাহিনির বুনটে পুনরায় সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন সমরেশ, সেই অঞ্চলের কোনো এক যুবককে কেন তিনি উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, মূল চরিত্র করে তুললেন না? সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) এক পরাজিত, ভাগ্যবিড়ম্বিত সৈনিক এই উপন্যাসের মূল চরিত্র। তার আদত নাম হীরালাল। অবাঙালি হীরালাল, সেই জগদ্দল-সেনপাড়ার নিম্নবর্গীয় মানুষের আদরের লখাই হয়ে উঠবে। বৃটিশ রাজশক্তির ইচ্ছায়, তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে যে চটশিল্প সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক শিল্প হিসেবে এদেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের কোনও ভূমিজ সন্তানকে দিয়ে করানো যেত না? ড সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমরেশ বসু: জীবন ও শিল্প' শীর্ষক আলোচনায় লখাইকে বহির্বঙ্গ ভারত থেকে বঙ্গে উড়িয়ে ফেলা মহাবিদ্রোহের এক স্ফুলিঙ্গ হিসেবে দেখেছেন – "সমরেশের 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের নায়ক লখাই সেই মহাবিদ্রোহের উড়িয়ে ফেলা স্ফুলিঙ্গ।"[৩] কেন বহির্বঙ্গ থেকে আনা এক ভাগ্যবিড়ম্বিত সৈনিককে এই প্রেক্ষাপটে এনে ফেলতে হল তার একটা কারণ হল মহাবিদ্রোহের যে ইংরেজবিরোধী ভাবধারা তা বাংলার মাটিতে বহির্বঙ্গ ভারতের মতো করে সমর্থন লাভ করতে পারেনি খুব একটা। সেখানে সমরেশ আঁকতে চলেছেন গ্রামবাংলার কিছু শোষিত মানুষের চিত্র, তাদের অসহায়তা, পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনচেতনার বিবর্তনের কথা। তাদের শিক্ষাদীক্ষা, মানসিকতা বা বুদ্ধিবৃত্তিও বেশিরভাগেরই এতখানি নয় যে তারা তাদের অসহায়ত্বের মূল নির্ণয় করে ফেলতে পারে। বিদেশিশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্ষম ও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে। তাদের মধ্যে অনেকের আর্থিক অবস্থা শ্রীহীন হতে হতে ক্রমশ দেওয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গেছে। নিজেদের জীবন দিয়ে অত্যাচারের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে তারা প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। ধনবান স্বদেশি মানুষের অত্যাচার তো আছেই, তার চেয়েও বড় কথা, দেশ যে অন্যজাতির অধীন, সেই বিদেশি জাতির মানুষের ব্যবসায়িক লাভের জন্য তাদের সস্তার শ্রমিকে পরিণতি, এই অধীনতা যে গ্লানিকর, সেই বোধ তাদের ততখানি ছিল না। আসলে তারা অত্যাচারিত, তারা 'অত্যাচারক'কেই চিনেছে কেবল, তার শ্রেণিবিভেদ বোঝেনি। এই অধীনত্বের গ্লানি অনুধাবন করা সম্ভব ছিল হীরালালের মতো এক মানুষের পক্ষে, যিনি স্বয়ং সিপাহী বিদ্রোহের সৈনিক। জগদ্দল সেনপাড়া অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে লখাই হয়ে উঠলেও সে ভোলেনি তাঁর দেশপ্রেমিক সত্তাকে। তাই তাঁর জীবনচেতনা অন্যান্যদের জীবন সংলগ্ন হয়েও আলাদা। সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন' গ্রন্থে বলেন, "১৮৫৭-র বিদ্রোহের যে রাজনৈতিক চেতনা, বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-চেতনা হীরালালের ছিল, সে যেখানে এসে পৌঁছাল সেখানকার মানুষদের তা ছিল না। তারা অতীতের স্মৃতিবাহী আর বর্তমানের ভাঙ্গনের সর্বনাশের অসহায় দর্শক : কার্যকারণও বুঝতে পারে না। সর্বগ্রাসী চটকলের থাবার মধ্যে তারা ধরা দেয় : বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাঁড়াশিতে উচ্ছেদ হয়।... পূর্বভারতে হীরালালের এই অঞ্চলে লখাই-এ রূপান্তর তাই প্রতীকী। তার শেষ অসহায়তাও ইতিহাসের যুগান্তরের তাৎপর্যে অঙ্কিত : সমগ্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটিই এতে ধরা পড়ে।"[৪] ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রকোপে দেশজ সংস্কৃতির পরিবর্তন ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সচেতন এরকম একজন মানুষের চোখ দিয়ে অবশ্যই দেখানো প্রয়োজন ছিল।

হীরালাল বাংলার যে অঞ্চলে যে সমাজে এসে পড়েছিল তা প্রান্তীয় মানুষের সমাজ। আর্থিক কাঠামো এদের নিম্নবৃত্তীয় বলে দেগে দেয়। ড. রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "এক ঐতিহাসিক কালখণ্ডের আধারে একটি বিশেষ অঞ্চলের বিভিন্ন বৃত্তিজীবী নিম্নবর্গের মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনী 'উত্তরঙ্গ'। ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ের

পবিবর্তনের স্রোত – মানুষের জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।"[৫] উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এই সমাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হতে থাকে। হীরালালকে প্রথম দেখেছিল বুড়ো পাটনির কিশোর সন্তান চূড়ামণি। উত্তেজক-উপাদানপূর্ণ কৌতূহলজনক সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে তার আবার প্রবল আগ্রহ। সে তাঁর বাবাকে খবর দেয়, "ভোর রাতে মস্ত এক ডাকাতের দল ধরা পড়েছে, জানো বাবা?"[৬] কিন্তু এত কৌতূহল যে ছেলের মধ্যে, লেখাপড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তার লেখাপড়ার তেমন ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয় না। সে তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, "পঞ্চাশ-জন? সে ক'শো হবে গো বাবা?"[৭] সামান্য হিসাবশাস্ত্রে তাঁর এই অজ্ঞতা উপন্যাসে বর্ণিত পাড়াগেঁয়ে এক নীচুতলার সমাজের প্রকৃত অবস্থাকেই চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দেয় পাঠকসমাজকে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলে মাঝি পাড়ার অবস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, "ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"[৮] আর ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে লেখা এই উপন্যাসে বর্ণিত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝি সমাজের এইরকম টুকরো টুকরো চিত্র। নবজাগরণের নতুন আলো একপ্রকার বলা যেতে পারে এই সমাজে 'খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।' তারা কিন্তু যে তিমিরে, সেই তিমিরেই। অথচ উনিশ শতকের কলকাতা যেখানে শিক্ষা সংস্কৃতি মনন মেধার পীঠস্থান, তার খুব একটা দূরে তারা বাস করছিল না।

জগদ্দল-সেনপাড়া অঞ্চলের মানুষের ধর্ম, সমাজ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা করা যায় সিপাহী হীরালাললে প্রথম দেখে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা, মত, মতপার্থক্য থেকে। বুড়ো পাটনির মধ্যে দেখি নিয়তির প্রতি বিস্তর বিশ্বাস। নিয়তি মানুষের জীবনকে অনিশ্চয়তার সমুদ্রের দিকে যাত্রা করায়, তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই মানুষের। বুড়ো পাটনির মতো দেবতার লীলায় বিশ্বাসী যে ঐ অঞ্চলের প্রায় সকলেই তা বুঝতে পারা যায় তাদের কথোপকথনে। ইংরেজ রাজত্ব চলছিল, তবে তাদের অটল বিশ্বাস মা মনসার প্রতি। বুড়ো পাটনি বলে, "ওইখানের মা মনসা ওকে দয়া করে এখানে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ও তোমার দিনু হারু (দিনেমার হার্মানি অর্থাৎ আর্মানি) য্যাতই ভোল পালটে দিক, ভগমানের নীলা থাকবে চেরকাল ধরে।"[৯] উপস্থিত সকলের গা ছমছমে একটা অনুভূতি হয়। অবশ্যই তা বিশ্বাস থেকে, শুধু মা মনসা নয়, রুষ্ট ক্ষুব্ধ সমস্ত দেবদেবীদের আস্তানা তাদের জঙ্গলপীড়ের দহ সেকথা স্মরণ করে। বাইরে ইংরেজ, পর্তুগিজ, ফরাসিদের একের পর এক ভারত অভিযানে দেশীয় ব্যবস্থাপনার ভাঙন ধরলেও যুগের পর যুগ ধরে লালন করে আসা মানুষের ধর্মচেতনা সংস্কৃতিচেতনা যে অত সহজে ভাঙে না তা এর থেকে বোঝা যায়। কেউ কেউ অবশ্য নতুন হাওয়া নিয়ে আসতে চায় ওইসব অঞ্চলে, অবিশ্বাসের কথা বলে। কিন্তু তার পাশাপাশি দেখা যায় তাকেই তিরস্কার করে মুসলমান এক ব্যক্তি – "পীর আর ওর মাথায় নেই। ফরাসডাঙার পাদরি সাহেবরা পেয়ার করে ওকে মাডুন বলে ডাকে, ডাব খাইয়ে বখশিশ পায়, ধর্মে কি আর ওর মতিগতি আছে?"[১০] বোঝা যায়, ধর্ম আলাদা হলেও ছিল শ্রদ্ধা সম্মান ও পারস্পরিক সহাবস্থান। দেবদেবীর প্রতি খানিকটা অন্ধবিশ্বাস ছিল ঠিকই তবু মানবিকতাও ছিল, যা তারা নতুন পাশ্চাত্যশিক্ষার মাধ্যমে শেখেনি, হৃদয়ধর্ম তাদের শিখিয়েছে, অচেনা মানুষকে গৃহে স্থান দিয়ে পরিবারের একজন করে নেওয়া যার প্রমাণ বহন করে।

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারী মানুষের বিবর্তনের রূপরেখা যেমন এই উপন্যাসে পাওয়া যায়, তেমনই মুসলমান সমাজের কথাও লেখক সমান গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। ধর্মীয় পার্থক্য থাকলেও পরিণতির দিক থেকে হিন্দু বা মুসলমান কারোরই অন্তিম অবস্থান তেমন সুখকর হয়নি। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিক ভাঙাগড়া, প্রান্তিক সমাজে তার প্রভাব এবং এই ভাঙাগড়ার ফলে সামাজিক ও মানসিক বিবর্তন বুঝে নেওয়া যেতে পারে পবন চাঁড়াল, কানু ভড়, কাটুনি বউ, তারা, গনি মিঞাদের কথা থেকে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'সীমান্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) ঠিক পরপরই লেখা এ গল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্যান্য নানা সংকটের মতোই এদেশে বস্ত্রসংকট এবং বাংলার তাঁতিদের বয়নযোগ্য সুতোর আকাল সঙ্গে করে নিয়ে আসে। শিল্পী মদন তাঁতি এই গল্পে শেষ পর্যন্ত থাকে অনমনীয় – "তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এটটু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে?"[১১] এ তার শিল্পীমনের সৎ, নির্লোভ প্রকাশ। কিন্তু বাস্তবে এ কথাও

মেনে নিতে হয় যে অনেক তাঁতি সমস্যায় পড়ে নিকৃষ্ট কিছু বুনতে বাধ্য হয়েছেন, অথবা মৃত্যু কিংবা পিতৃপুরুষের জীবিকাবদল তাদের একমাত্র ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনিশ শতকেও শিল্পায়ন, শিল্পের ব্যাপক প্রসার বাংলার কুটিরশিল্পী, তাঁতশিল্পীদের ভয়াবহ পরিণতি ডেকে এনেছিল। সমরেশ বসু উনিশ শতকের তাঁতিদের দুরবস্থা দেখেননি বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বস্ত্রশিল্পীদের জীবনযুদ্ধ অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁতিজীবনের সংকট বিষয়ে পরবর্তীকালে তিনি সম্পূর্ণ একটি উপন্যাসও রচনা করেন, যার নাম 'টানাপোড়েন'। তাঁতের টানাপোড়েনই যেন 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের তাঁতি কানু ভড়ের মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের দৃশ্যরূপ বলা যায়। রেললাইন পাতার পর থেকে সমূহ সুতো কাঁচামাল হিসেবে বিদেশে রপ্তানি হতে শুরু করে, এ দেশে দেখা দেয় সুতোর অভাব। তারপর এ দেশেই চটকল স্থাপিত হতে থাকে। কানু ভড় পেটের দায়ে কলে কলমজুরি করতে গিয়েও যেতে পারে না। প্রকৃত শিল্পী সে, সে কথা লখাই স্মরণ করিয়ে দিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বিশ শতকের মদন তাঁতিরও ভবিষ্যৎ স্পষ্ট করে বলা না থাকলেও বোঝা যায় যে শিল্পের সঙ্গে আপোষ করবে না সে, তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। আর সমরেশের বিশ শতকের কলমে উনিশ শতকের তাঁতিজীবনেরও এক ধরণের রূপায়ণ দেখি, তাঁতঘরের মাচার বাঁশে কানুর আত্মহত্যা। শিল্পের সঙ্গে আপোষও সম্ভব নয়, আবার আপোষ ছাড়া জীবনধারণও সম্ভব ছিল না। শুধু সে নয়, তার স্ত্রী কাটুনি বউও বুঝেছিল তাদের শিল্পকে ব্যবসায়িক লাভের জন্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে তাঁতশিল্পী, কাসা-পিতলের বাসনশিল্পীদের জীবন। যারা তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে, কাটুনি বউয়ের জীবনবোধ তাকে শিখিয়েছে জীবনের বিনিময়ে হলেও তাদের অর্থসাহায্য, ভিক্ষার দানের প্রত্যাশা না করতে – "থাক, তার দরকার নেই। সেজবাবুকে বলো আমার জবানি দে আর একখানা চিঠি লিখে দিতে যে, গায়ের জোরে যারা সব নিল তাদের কাছে দয়া মেগে কি কিছু পাওয়া যাবে?"[১২] – এ নিছক একটি উক্তি নয়, আসলে এক সর্বস্বান্ত নারীর জ্বলন্ত প্রতিবাদ।

সাধারণত শিল্প-কারখানা তৈরির জন্য বেছে নেওয়া হয় অনাবাদী জমি। কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত অঞ্চলে সে সময় অনাবাদী জমি অপ্রতুল। অথচ তৎকালীন বিদেশি শাসকশক্তি এইসব অঞ্চলে শিল্প গড়ে তুলতে চায়। বিভিন্ন মানুষের জমি কেড়ে কারখানার কাজ হবে বলে একপ্রকার নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়। মুরলীদাস বাবাজীদের পিতৃপুরুষের আখড়া থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া আছে কোম্পানির নতুন খাজনা আইন। গবেষক শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে মহাবিদ্রোহ' গ্রন্থে বলেছেন, "জমির নতুন আইনে ভিটেমাটি ছাড়ার ব্যবস্থা করে ইংরেজ।... ইংরেজের নতুন জমি আইনে মহাজনের রমরমা ঘটে, জমি খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। তাঁতি, জোলা, কামার, জেলে সকলেই বৃত্তি সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।"[১৩] যে সকল প্রজারা জমিদারের জমিতে চাষ করে, তারা খাজনা দিয়েই চাষাবাদ করছিল। কিন্তু জমিদার ইংরেজের একপ্রকার গোলাম। তার ওপর আছে বর্ধিত হারে খাজনার লোভ। নতুন খাজনা আইন। অনাবাদী জমির অভাবে আবাদী জমিই নীলামে ডাকা শুরু হয়। লখাইয়ের বন্ধু পবন চাঁড়াল এই উপন্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে জানত, তাঁরা খাজনা দিয়ে বাস করে। আইন অনুযায়ী তাদের খাজনা দেওয়া সত্ত্বেও উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। যারা বাস্তববাদী, একটু বয়স্ক ও অভিজ্ঞ, তারা সাবধান করে দিতে চান। যেমন পুরনো দিনের লোক কালো দুলে বলে, "ও-সব অনাছিষ্টির কথা বলিসনে পবনা। দিনকাল বুঝে কাজ করতে নাগে, বুচলি। ইকে বাস বোলতার সঙ্গে, বিবাদ চলেনে। হাতে পায়ে ধরে পড়গে।"[১৪] পবন অবশ্য ডাকাবুকো, সাহসী। সে উল্টো কথা বলে। জমিদারের বিরুদ্ধে না গেলেও জমি নীলামে ডাকা হবে এবং তাদের মতো হতভাগ্য প্রজাদের উচ্ছেদ করা হবে। আর আইনের পথে লড়লেও জমিদার বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের উচ্ছেদ করে দেবে, জমিদারির ত্রিসীমানায় স্থান দেবে না। অতএব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দুদিকেই প্রায় সমান দেখে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়ে একবার দেখতেই চায় পবন – "একবার নয় প্যাঁচ কষেই দেখব।"[১৫] তার জীবনচেতনা সংগ্রামী মানুষের চেতনা। কিন্তু জমিদারও যে আসলে ইংরেজের হাতের পুতুল, সে কথা লখাই বুঝিয়ে দিলেও পবন চাঁড়ালের মধ্যে সে বোধের বিকাশের তেমন কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। সম্মুখ শত্রু যে, যে সরাসরি তাদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে চাইছে, পবন তাদের বিরুদ্ধে লড়তে চায় এই চটশিল্প প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা ইংরেজেরই আইনের দ্বারস্থ হয়ে।

আবাদী জমি নীলাম হতে শুরু করলে যে সকল চাষীর জমির ভাগ কম, তাদের একপ্রকার উৎখাত হতে হল। যাদের জমির অংশ বেশি, তাদের কিছু কিছু অংশ ছাড় পেলেও স্বল্পপরিমাণ জমির চাষীর অবস্থা সর্বস্বান্ত। দেনার দায়ে একজন ভূমিহারা চাষীতে পরিণত হল পবন চাঁড়াল। সে একদিন ইংরেজের আদালতে নালিশ করে এই নির্মমতার বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছিল, কিন্তু ভূমি হারানোর পর সে ইচ্ছে তার মধ্যে আর দেখা যায় না। কিন্তু এই পরিবর্তনেও তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত জীবনচেতনার প্রবাহকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। ভূমিহারা পবন, ভিটে থেকে উৎখাত পবনের মধ্যেও দেখা যায় জীবনস্রোতকে, পরিবর্তনকে মেনেও জীবনকে কানায় কানায় উপভোগের ইচ্ছা - "ভিটা সম্পর্কে দুঃসংবাদ পেলেও পবন হেসেছে, নেশা করেছে, বউ তারাকে নিয়ে সোহাগ করেছে।"[১৬]

বিনা দোষে কর্মহীন হয়ে পড়া, জীবিকা পরিবর্তনের প্রয়োজন যে মানুষের মানসিক স্ফূর্তি কেড়ে নিতে পারেনি, জাতপাতের বৈষম্য তাঁকে অন্তর থেকে একইসঙ্গে গভীর দুঃখিত, ক্রুদ্ধ এবং অসহায় করে তোলে। পবন চাষী হলেও চুলে টেরি রাখার ইচ্ছে তার যৌবনধর্মের দিকে ইঙ্গিত করে। যে ধর্ম কোনও সংকটেই পরাজিত হতে চায়নি। পালবাবুরা ছোটলোকের টেরি রাখা তার ঔদ্ধত্য মনে করে, নাপিত ডেকে তৎক্ষণাৎ পবনকে শাস্তি দেওয়া হয়, তার চুল কেটে নেওয়া হয়। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে এভাবেই চিত্রিত হয়েছে শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ নয়, হিন্দুসমাজের বৈষম্যের চিত্রও। বলা বাহুল্য, পবন প্রতিবাদ করতে পারেনি। যে প্রতিবাদী পবনকে পূর্ব অধ্যায়গুলিতে দেখা যায়, তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। অসহায়ত্ব, বিচার না পাবার ক্রন্দন ঘিরে ধরে চরিত্রটিকে, সে বলে, "ভগবান এ হাত-পা-বাঁধা ছোটলোকদের তবে কেন তুমি জন্মো দেও, কেন দেও, কেন দেও। আর সে জন্মো দিয়ে যদি এই তোমার খেলা হয়, তবে বলি ভগবান, তুমি গরিবের কেউ নও।"[১৭] অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক বৈষম্যই চরিত্রটির প্রতিবাদী জীবনচেতনার অসহায়ত্বপূর্ণ পরিণতির জন্য দায়ী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকে খনি শ্রমিকেরা ছিল সংখ্যা, বিশু পাগলের উক্তি – "গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।"[১৮] তাঁরা যে মানুষ সে কথা স্বীকার করতে চায় না মালিকপক্ষ। আর এই উপন্যাসে ওয়ালিক সাহেবকে বলতে শুনি, "যব তুম্ মেশিন মে হাত লাগায়েগা, সমঝো তুমভি মেশিন।"[১৯] এইভাবে জীবিকার রূপান্তর, সামাজিক শোষণ, যন্ত্রে পরিণতি চেতনাকে যেন অসহায়ত্ব থেকে জড়ত্ব দিতে থাকে। সমালোচক ড. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "…'appendix of machine' -এর মতো মানুষগুলো একেবারে জড়যন্ত্রবৎ।"[২০] পবনের স্ত্রী তারার ভালোবাসা ভয়ে পরিণত হতে থাকে। প্রতিবাদী চেতনার মানুষের প্রতিবাদের মৃত্যু, হতাশার জন্ম, যান্ত্রিক জীবনচেতনার জড়ত্ব শেষ অবধি আত্মহত্যার পথই তাই নির্দিষ্ট করে দেয়।

ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয় ইংল্যান্ড থেকে। কৃষি বিপ্লব ছিল সেই শিল্প বিপ্লবের অন্যতম কারণ। কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং শ্রমিকদের জন্য সুলভ খাদ্য সস্তায় যোগাতে সহায়ক হয়। কৃষি বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে কৃষকদের অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছও হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে শিল্পায়নের চিত্র দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক, সেখানে একের পর এক কৃষকের দুরবস্থা চিহ্নিত হয়েছে। শুধু দুরবস্থা নয়, তাদের চরম রূপান্তর। পবন চাঁড়ালের কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, উপন্যাসে গনি মিঞা নামক এক সামান্য কৃষকের অবস্থাও তথৈবচ (যদিও গনি মিঞারা প্রকৃতপক্ষে ছিল জোলা, কোম্পানির অত্যাচারে জাতব্যবসা ছেড়ে মাঠে নেমেছিল।)। তবে দুজনে অর্থাৎ পবন এবং গনি প্রায় একই অর্থনৈতিক অবস্থান সংলগ্ন জীবনযাপন করলেও তাদের অন্তর্লীন জীবনচেতনা একইরকম ছিল না। পবন চাঁড়ালের মধ্যে যেখানে প্রথমে ছিল শত্রুর সঙ্গে যুঝে নেবার প্রাবল্য, গনি মিঞা কিন্তু প্রথম থেকেই শোষকশক্তির আঁতাতকে, মূল উৎসকে চিনতে শিখেছিল। লখাইয়ের অন্তরের মধ্যেকার সিপাহী হীরালালের দেশপ্রেমমগ্ন জাতীয়তবাদী জীবনচেতনা, বিদেশি শক্তির স্বরূপকে চিনতে পারার ক্ষমতা পবন চাঁড়ালের ছিল না। কিন্তু গনি মিঞা তা বুঝেছিল – "ঠিক বলেছে লখাই। আল্লার হুকুম আমরা কেউ মানিনি। আমরা কাফেরকে তোয়াজ করে বসতে দিইছি।"[২১] অনমনীয়তাই এই চরিত্রটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ধর্মের ভিন্নতা তাঁকে সংকীর্ণ করে রাখেনি। সমাজের নীচুতলার মজলিসে সে আর পাঁচজন হিন্দু নিম্নবর্গের সঙ্গেই বসেছে। মিশেছে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে। শরাফত মিঞা আর সে একই ধর্মের মানুষ, কিন্তু শরাফত গনি মিঞার বিবি লতিফার দিকে কুনজর দেয়। ক্ষমতার, অর্থের দিক থেকে শরাফত অনেক বেশি শক্তিশালী, সেই দম্ভের আস্ফালন তার কণ্ঠে – "বেল দেখে

কাকের নোলায় জল। গনির উচিত লতিফাকে আমার মোকামে তুলে দেওয়া।... একমাত্র শরাফতের বিবি হওয়া ছাড়া লতিফার গত্যন্তর নেই।"[২২] কিন্তু দুঃখী বলে, গরিব বলে গনি আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য নয়, তা আবারো বোঝা যায় যখন সে বলে, "কিছু না হোক, শরীরে খেটে দিনমজুরি তো করতে পারব। কুম্পানির এলের নাইন পাতব, পরের জমিনে মজুর খাটব। তা বলে শরাফতের দৌলতখানায় তোকে আমি যেতে দেব না।"[২৩] হিন্দু নগিন ঘোষের কাছে তার টাকা ধার করতে মান যাবে না, কিন্তু যে তার বিবির দিকে কুনজর দেয়, তার টাকা সে ছোঁবেও না। জীবনের শেষদিন অবধি এই আত্মসম্মানবোধ, মানসিক শক্তি তার জীবনচেতনার মূলমন্ত্র ছিল।

গনি মিঞা, কানু ভড় শেষ হয়ে গিয়েছে মৃত্যুর মধ্যে। পবন চাঁড়াল কলে গিয়েও শেষ অবধি আত্মহত্যা করেছে। লখাই এক অসীম শূন্যতাবোধ নিয়ে সমসাময়িক পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করে গিয়েছে। কিন্তু গনি মিঞার ছেলেকে যেতে হয়েছে চটকলে। সে কিশোর বয়সেও উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেরাত, এই উলঙ্গতা আসলে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা। যা তাদের মতো মানুষের শেষ বস্ত্রখণ্ডও কেড়ে নিয়েছে। চটকলে হয়তো তাদের জীবন রক্ষা পাবে। গনি মিঞার ছেলে, লখাইয়ের ভাইপো এরা সব নতুন প্রজন্ম। আত্মহত্যা, মৃত্যু তাদের জন্য নয়। তাদের জীবনচেতনা জীবন রক্ষার পথই নির্দেশ করেছে। জীবন রক্ষার্থে নতুন দিনের ব্যবস্থাকে, শিল্পপ্রসারকে স্বীকরণ করে নেওয়াই তাই তাদের জীবনধর্ম। সিপাহী হীরালালের ইংরেজবিদ্বেষ কারণসঙ্গত হলেও বিজ্ঞানের প্রসারকে রোধ করা ছিল কার্যত অসম্ভব। দেশের মানুষ দেশ শাসন করবে এই ছিল তাঁর জাতীয়তাবয়াদী চেতনা। আর উপন্যাসের একদম শেষে শিল্পকারখানার অন্যতম যন্ত্র সিলিন্ডার মনে করে একটি পেরেক এ দেশের মাটিতে পুঁতে দেয় আর কোনও বিদেশি নয়, সিপাহী হীরালাল নয়, তবে হীরালালই। তার আত্মজ, শিশু হীরালাল। এই দেশের সন্তান। - "সল, সল... ছিলিন্দারতা খালা ক'লে দিই।"[২৪] সিপাহী হীরালালের অসহায়তা থাকলেও এখানে জাতীয়তার অন্য এক মাত্রা যেন প্রচ্ছন্ন। তা হল বিজ্ঞানের যুগকে স্বীকার করে, নতুন দিনের শিল্পকে দেশের মাটিতে দেশের মানুষ দিয়েই স্থাপন করার প্রয়াস।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। *ইছামতী।* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ। এপ্রিল ২০১৩। পৃষ্ঠা -৮
২. বসু, সমরেশ। সম্পাদক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। "সমরেশ বসু : ব্যক্তি ও লেখক"। *সমরেশ বসু রচনাবলী- প্রথম খন্ড।* । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ। জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা - ৮
৩. তদেব। পৃষ্ঠা - ৮
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম। *সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন।* কলকাতা : রাডিকাল ইম্প্রেশন। প্রথম প্রকাশ। আগস্ট ১৯৮৯। পৃষ্ঠা - ১৮
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান (১৯৪৭ - ১৯৭৭)।* কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। প্রথম প্রকাশ। নভেম্বর ২০০৫। পৃষ্ঠা - ১৬৪
৬. বসু, সমরেশ। *সমরেশ বসু রচনাবলী- প্রথম খন্ড।* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ। জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা - ১০৭
৭. তদেব। পৃষ্ঠা - ১০৮
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *পদ্মানদীর মাঝি।* কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স। ষষ্ঠ সংস্করণ। ভাদ্র ১৩৬১। পৃষ্ঠা - ১১
৯. বসু, সমরেশ। *সমরেশ বসু রচনাবলী- প্রথম খন্ড।* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ। জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা - ১১২
১০. তদেব। পৃষ্ঠা - ১১২
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।* কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স। নূতন সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ। আষাঢ় ১৩৭২। পৃষ্ঠা - ১১৩

১২. বসু, সমরেশ। *সমরেশ বসু রচনাবলী- প্রথম খন্ড*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ। জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা - ১৭৬
১৩. চক্রবর্তী, শঙ্করপ্রসাদ। *বঙ্গসাহিত্যে মহাবিদ্রোহ।* কলকাতা : করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ। জানুয়ারি ২০০৮। পৃষ্ঠা - ৪১৯
১৪. বসু, সমরেশ। *সমরেশ বসু রচনাবলী- প্রথম খন্ড।* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ। জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা - ১৫৪
১৫. তদেব। পৃষ্ঠা - ১৫৪
১৬. তদেব। পৃষ্ঠা - ১৬৫
১৭. তদেব। পৃষ্ঠা - ১৬৭
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রক্তকরবী।* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। গ্রন্থপ্রকাশ। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা- ৩৭
১৯. বসু, সমরেশ। *সমরেশ বসু রচনাবলী- প্রথম খন্ড।* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ। জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা - ১৮৯
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই। *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু।* কলকাতা : সাহিত্য প্রকাশ। প্রথম প্রকাশ। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। পৃষ্ঠা - ১৮
২১. বসু, সমরেশ। *সমরেশ বসু রচনাবলী- প্রথম খন্ড।* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ। জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা - ১৫৫
২২. তদেব। পৃষ্ঠা - ১৫১
২৩. তদেব। পৃষ্ঠা - ১৫৩
২৪. তদেব। পৃষ্ঠা - ২০১

গ্রন্থপঞ্জি :

১. চক্রবর্তী, শঙ্করপ্রসাদ। *বঙ্গসাহিত্যে মহাবিদ্রোহ।* কলকাতা : করুণা প্রকাশনী। জানুয়ারি ২০০৮।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রক্তকরবী।* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই। *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু।* কলকাতা : সাহিত্য প্রকাশ। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম। *সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন।* কলকাতা : রাডিকাল ইম্প্রেশন। আগস্ট ১৯৮৯।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। *ইছামতী।* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং। এপ্রিল ২০১৩।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *পদ্মানদীর মাঝি।* কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স। ভাদ্র ১৩৬১।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।* কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স। আষাঢ় ১৩৭২।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান (১৯৪৭ - ১৯৭৭)।* কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। নভেম্বর ২০০৫।
৯. বসু, সমরেশ। *সমরেশ বসু রচনাবলী- প্রথম খন্ড*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। জানুয়ারি ১৯৯৭।